প্রবন্ধ ১

মহরম আনন্দের উৎসব, না বিষাদের?

জহর সরকার

১৩ অক্টোবর, ২০১৬, ০০:৪১:০০

—নিজস্ব চিত্র।

সত্যি বলতে কী, মুসলিম সমাজের বাইরে বেশির ভাগ মানুষ ঠিক বুঝতে পারেন না, ‘শুভ মহরম’ বার্তা পাঠানো উচিত কি না। মহরম আসলে একটি দিন নয়, একটি মাস। ইসলামি হিজরি ক্যালেন্ডারের প্রথম, এবং পবিত্রতম মাসগুলির একটি। প্রসঙ্গত, প্রাক্-ইসলাম পশ্চিম এশিয়াতেও কিছু কিছু মাসকে পবিত্র বলে মনে করা হত এবং সেই সব মাসে যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল।

মহরম এবং তার রীতি ও আচারগুলির অর্থ বুঝতে চাইলে আগে একটু ইতিহাসের সন্ধান জানা দরকার। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে হজরত মহম্মদের বিদায়ের পরের ইতিহাস। পরস্পর দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে লিপ্ত বিভিন্ন আরব গোষ্ঠীকে মহম্মদ যে ভাবে একটি ধর্মের সূত্রে সংহত করেছিলেন, তার তুলনা বিরল। কিন্তু তার পরেও কিছু কিছু গোষ্ঠীগত টানাপড়েন, বিরোধ এবং অনৈক্য তলায় তলায় থেকে গিয়েছিল। নবী কাউকে তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে আনুষ্ঠানিক ভাবে চিহ্নিত করে যাননি, ফলে তাঁর মৃত্যুর পরে তর্ক উঠল — গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে নেতা বেছে নেওয়া হবে, না বংশপরম্পরা অনুসারে। সহজ করে বললে, সুন্নিরা চেয়েছিলেন, নবীর বিশ্বস্ত বন্ধু এবং সচিব আবু বকর ইসলামের নেতা হোন। অন্য দিকে, শিয়ারা সেই আসনে বসাতে চেয়েছিলেন মহম্মদের জ্ঞাতি-ভাই তথা জামাই হজরত আলিকে। কার্যক্ষেত্রে দু’জনেই নিজের জীবনে সেই পদটি পেয়েছিলেন। প্রথম খলিফা হন আবু বকর। আমৃত্যু তিনি এই পদে ছিলেন। তাঁর পরবর্তী দুই খলিফা আততায়ীর হাতে খুন হলে সেই আসনে বসেন আলি।

বড় সমস্যা বাধল আলির মৃত্যুর পরে। আলির বড় ছেলে ইমাম হাসান মক্কায় চলে গিয়েছিলেন, যেখানে তিনি পরে আততায়ীর হাতে প্রাণ হারাবেন। শিয়ারা দাবি করলেন, আলির অন্য ছেলে ইমাম হুসেনকে খলিফা করতে হবে, কারণ তাঁর দেহে হজরত মহম্মদের রক্ত বইছে। সুন্নিরা এই দাবি মানলেন না, তাঁরা বললেন, মহম্মদ এমন কোনও নিয়মের কথা বলে যাননি, এবং এই বংশানুক্রমিকতা ইসলামের স্বধর্মও নয়।

পরিস্থিতি খুব ঘোরালো হয়ে উঠল, কিন্তু হুসেন অকুতোভয়, তিনি খলিফার আসন গ্রহণের জন্য মক্কা থেকে রওনা হলেন। বাগদাদের কাছে ইয়াজিদের বাহিনীর হাতে পরাজিত ও নিহত হলেন আলি, নিহত হলেন তাঁর বাহাত্তর জন সঙ্গী, নারী এবং দুধের শিশু সহ। সেটা ৬৮০ খ্রিস্টাব্দ, মহরম মাসের দশম দিন, যার নাম ‘অশুরা’। স্থানটি ছিল কারবালার প্রান্তর, যে প্রান্তরে

খোলা তরবারির আঘাতে ইসলাম দ্বিখণ্ডিত হল। শিয়ারা স্বভাবতই মহরম মাসটিকে গভীর বিষাদের কাল হিসাবে পালন করেন, 'অশুরা'র দিনটি সেই বিষাদপর্বের চরম ক্ষণ।

সুন্নিরা অবশ্য মনে করেন, অশুরা-র তাৎপর্য কেবল সেই একটি ঘটনাতেই সীমিত নয়। তাঁদের মতে, মহম্মদ স্বয়ং এই দিনটিকে বিশেষ ভাবে পবিত্র বলে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এই দিনেই মোজেস বা নবী মুসা সমুদ্রের জল দু'দিকে সরিয়ে দিয়ে ঈশ্বরের 'নির্বাচিত মানুষ'দের (অর্থাৎ ইহুদিদের) মিশর থেকে নিষ্ক্রমণের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাইবেলে উল্লেখিত অন্য নানা 'প্রফেট'-এর (মুসলিমরা যাঁদের নবী বলেন) জীবনের অন্য নানা ঘটনাও এই অশুরা-র দিনটির সঙ্গে জড়িত। তাঁদের মধ্যে আছেন অ্যাডাম বা আদম, নোয়া বা নুহ, জোব বা আয়ুব। এখানে একটা ব্যাপার সত্যিই চমকপ্রদ। ইহুদি-ধর্ম, খ্রিস্টধর্ম এবং ইসলাম— তিনটি সেমিটিক ধর্মই আজও তাদের 'অভিন্ন ইতিহাস' অনেকখানি ধরে রেখেছে, একই প্রফেট বা পয়গম্বর বা নবীর স্বীকৃতির মধ্যে দিয়ে, কেবল উপরোক্ত তিন জনই নয়, তালিকাটি দীর্ঘতর: আব্রাহাম-ইব্রাহিম, আইজ্যাক-ইশাক, জেকব-ইয়াকুব, জোসেফ-ইউসুফ...

অশুরা-র দিনে তো বটেই, তার আগের কয়েক দিনও শিয়া মুসলমানরা তাজিয়া এবং অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মিছিল বার করেন, তবে সুন্নিরাও এই দিনটিকে তাঁদের মতো করে পালন করেন। ওয়াহাবি বা সালাফির মতো কিছু কট্টরপন্থী মতাবলম্বী গোষ্ঠীকে বাদ দিলে, সুন্নিদের একটা বড় অংশও ইমাম হুসেন এবং অশুরা-র প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল, যদিও শিয়াদের মতো জনপরিসরে শোকপালনের বা নিজেকে যন্ত্রণা দেওয়ার আচার তাঁদের নেই। এখানে সুফিধর্মের কথা বলা দরকার। সুফি মত কেবল হিন্দু-মুসলমান নয়, শিয়া-সুন্নির মধ্যেও একটা সেতু বেঁধেছে। সাদিয়া দেহলভি বা মুজফফর আলিরা আমাদের মহরমের দিনগুলিতে আজমেঢ় শরিফে প্রচলিত রীতির কথা খেয়াল করিয়ে দিয়েছেন— শিয়া, সুফি বা হিন্দু গায়করা এই সময় দশ দিন গানবাজনা বন্ধ রাখেন, এবং দুই ধারার মুসলমানরাই প্রকাশ্য উৎসবে যোগ দেন না।

ভারতে সতেরো-আঠারো শতক থেকেই ইউরোপীয়দের তৈরি বহু রিপোর্ট পাওয়া যায়, যেখানে হায়দরাবাদ, মুম্বই, লখনউ, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, পটনা, হুগলি, কলকাতার মতো বিভিন্ন শহরে শিয়াদের খুব বড় সমাবেশের বিবরণ আছে— এ সব জায়গায় মহরম পালিত হত গাম্ভীর্য এবং আড়ম্বর সহকারে। উনিশ শতকে পিয়ের কলিয়ের-এর লেখায় পড়ি: 'অগণিত মানুষ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে, হাউহাউ করে কাঁদছে, তীব্র শোকে বিলাপ করছে; নিজের মুষ্টির আঘাতে তাদের বুকে কালশিটে, গায়ের চামড়া ক্ষতবিক্ষত; তাদের সারা শরীর রক্তে, ঘামে, ধুলো-কাদায় ক্লেদাক্ত, তাদের মুখমণ্ডল শোকাক্রান্ত, দু'চোখে আকুল আর্ত আবেগ; তারা আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে, অশ্রুপ্লাবিত নয়নে কারবালার বিষাদগাথা বলে যাচ্ছে—ধর্মীয় আবেগের এমন দৃশ্য দুনিয়ায় খুব কম দেখা যায়।'

শিয়ারা অনেকেই মহরমের সময় চাবুকের আঘাতে নিজের শরীরকে লাঞ্ছিত করেন কিংবা তরবারির লড়াইয়ে তাঁদের দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়। এই ভাবে তাঁরা হাসান-হুসেনের যন্ত্রণা অনুভব করতে চান। এমন রীতি অবশ্য অন্যত্রও প্রচলিত। পূর্ব ভারতে চড়ক বা গাজনের সময়, কিংবা দক্ষিণে তাই-পুসম-এ, ভক্তরা বড় বড় সুচ দিয়ে নিজেদের মুখ এবং জিভ এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করেন, অনেকে পিঠে বিরাট বঁড়শি বিঁধে আকাশে পাক খান। তাওধর্মী এবং বৌদ্ধদের মধ্যেও নানা জায়গায় নিজেকে কষ্ট দেওয়ার রীতি দেখা যায়, যেমন তাইল্যান্ডের ফুকেত-এ অক্টোবর মাসে নিরামিষ-এর উৎসবে। খ্রিস্টানরা এই সব আচারকে প্রথমে 'বর্বর আদিম সংস্কার' বলে নিন্দে করলেও ক্রমশ কোথাও কোথাও আত্মলাঞ্ছনার প্রথা ইস্টার-এর মতো উৎসবের মধ্যে ঢুকে পড়ে, যেমন ফিলিপিনসে কিংবা কিছু লাতিন আমেরিকান দেশে। গুড ফ্রাইডে'তে অনেক ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান ক্রুশবিদ্ধ যিশুর যন্ত্রণা উপলব্ধির জন্য নিজেদের দেহকে আক্ষরিক অর্থে ক্রুশবিদ্ধ করেন, কাঁটার মুকুট পরেন, শরীরে রক্ত ঝরান, বিশাল এবং ভারী শৃঙ্খল ও ক্রুশকাঠ ঘাড়ে নিয়ে চড়াই ভাঙেন।

কিন্তু শিয়া আচারের যে সব সূক্ষ্ম দিক আছে, এ-সব বিবরণে সেগুলি ধরা পড়ে না। মরসিয়া নামে পরিচিত মহাকাব্যে উর্দু কবিতা উৎকর্ষের এক শিখরে পৌঁছেছিল। তাদের স্রষ্টাদের মধ্যে ছিলেন মুনসি চান্নুলাল দিলগীর, মীর আনিস, মির্জা দবীর, জোশ মালিহাবাদি। আশ্চর্য সুন্দর সব কবিতা ও গান সমবেত ভাবে পঠিত বা গীত হত। মুম্বই চলচ্চিত্রের নামজাদা সুরস্রষ্টা নৌশাদও অবধের 'নোহা' থেকে তাঁর 'কোরাস'-এর প্রেরণা পেয়েছিলেন। ইতিহাস ও ধর্ম আবেগ জাগিয়ে তুলতে পারে, নানা রকম উৎসব তৈরি করতে পারে, কিন্তু আনন্দের হোক কিংবা দুঃখের— প্রত্যেক উৎসব মানুষকে সমবেত হওয়ার এবং একের অনুভূতি অন্যের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার সুযোগ দেয়, কবিতায়, গানে, নাচে বা অন্য নানা শিল্পরূপে অনুভূতি প্রকাশের অবকাশ দেয়। মহরম তার ব্যতিক্রম নয়।

TAGS : muharram